আধ্যাত্মিক মতবাদ শুনতে শুনতে যখন আমাদের অবস্থা নেশাগ্রস্ত মানুষের মত হয় তখন সেই নেশার ঘোর কাটাতে একবার উপ্পালুরী গোপাল কৃষ্ণমূর্তি-র (ইউজী-র) দরজায় আসতেই হবে।

ঈশ্বরের ধোঁকাবাজীতে যখন মাতাজী, বাবাজী-দের ক্যালেন্ডার - ফটো ঘরের মধ্যে টাঙিয়ে আমরা দিনের পর দিন একটা ধারণার ক্রীতদাসত্ব করি তখন 'বিশ্বাস'-এর নামে 'বিষাক্ত সাপের ছোবল' খেয়ে আনন্দ পাই।

গুরুর সঙ্গে আপনার কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য একটাই তিনি আপনাকে টুপি পরাচ্ছেন আর আপনি টুপি পরছেন।

কোথাও পৌঁছবার জায়গা নেই আমাদের। কেজি কেজি ঘি পুড়িয়ে ঘি বিক্রেতার লাভ আর বায়ু দূষণ ছাড়া কিছু হবে না।

অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য মানুষ যদি এগিয়ে যায় - তার জন্য দলের প্রয়োজন কেন ? গেরুয়া পরে, তিলক কেটে, 'মেক-আপ'-এর কি প্রয়োজন ?

দুঃখের বিষয়, আমরা সবাই 'তোতাপাখি'-ই হ'তে চাই। তাই গুরুর কথা শুনলে আমাদের উন্নতি, আর না শুনলেই সর্বনাশ।

শাস্ত্রের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় শুরু হয়েছিল ইউজী-র জীবন। বাল্যকাল থেকেই আধ্যাত্মিক জগৎকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এক অতি যন্ত্রণাদায়ক কোলাহল হিসেবে। ধরতে পেরেছিলেন এই সমাজের মূর্খামিগুলো। মানুষের জন্মানো, বেড়ে ওঠা ও মৃত্যু - এ সবই সূর্য ওঠা, ঝড়-বৃষ্টি হওয়া ..... ইত্যাদি
প্রাকৃতিক ঘটনার মতই একটা ঘটনা, তিনি অনুভব করেছিলেন।

আত্মবিশ্বাসের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে জীবনকে বারবার দেখতে চেয়েছেন।
এই শরীর কারো ক্রীতদাসত্ব করতে চায় না। 'মন' বলে কিছু নেই। আমাদের মাথায় ঢোকানো এক 'ধারণা'-র নাম হ'ল মন।

আধ্যাত্মিক বই পড়ে, ধ্যান করে যখন ডঃ সব্যসাচী গুহ-র নিজেকে প্রশ্ন করে মনে হয়েছিল তিনি তিনিই আছেন - উন্নতির মাপকাঠি কি ?

কোন উত্তর না পেয়ে ডঃ গুহ-র যখন প্রায় উন্মাদের দশা তখনই ইন্টারনেটে ইউজী-র কথোপকথন পড়েন। ডঃ গুহ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক মিল পান।

কথোপকথন পড়ে ডঃ গুহ বুঝতে পেরেছিলেন ইউজী একমাত্র লোক যিনি সত্যি কথা বলার সাহস রাখেন।

ডঃ গুহ জানলেন তর্ক করাই ঠিক - বিশ্বাস করা মানে নিজেকেই টুপি পরানো।

আমাদের মগজ সংগ্রহ করে তথ্য। সমাজের ঢুকিয়ে দেওয়া অর্থের ক্রীতদাস আমরা। মানুষ হ'ল যন্ত্র। আমাদের সকল কাজকর্ম আমাদের চিন্তারই সৃষ্টি।

কারোর মত হ'তে যাওয়ার অর্থ নিজেকেই শেষ করে ফেলা।

আমি ইউজী-কে দেখিনি। সান্নিধ্য পেয়েছি ডঃ সব্যসাচী গুহ-র। ডঃ গুহ-র সঙ্গে আমার আলাপ হয় ২০০৮ সালের মে মাসে - ওনার বন্ধুদের এক আড্ডায়।

শৈশবে ভূতের কথা শুনতে শুনতে আমাদের যেমন ভূতের ভয় জন্মায়, ঠিক একইভাবে ভগবানের কথা শুনতে শুনতে তাঁর কৃপা (!) পাওয়ার জন্য লোভ জন্মায়।
দুঃখের বিষয় বহু মন্ত্রী, সরকারী আমলা, উচ্চশিক্ষিত মানুষ গুরুজী-র 'লাথি' খেয়ে জীবনের সব দুঃখ দূর করতে চান।

আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা হ'ল কিছু বিজ্ঞানী নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ঈশ্বরকেই জগতের সৃষ্টিকর্তা বানিয়ে নিজেরাও ডুবছেন এবং বিজ্ঞানকেও ডোবানোর চেষ্টা করছেন।

এইসব প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্লজ্জ বৈজ্ঞানিকদের দ্বিচারিতা চোখে পড়ার মত। এঁরা অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, বাড়ীতে বিজ্ঞান আবিষ্কৃত সমস্ত আধুনিক সুবিধাগুলো নেন অথচ নারকেল ভেঙ্গে যাত্রা শুভ করেন।

এঁরা দুঃখ করেন কেন এঁদের ভগবানের ঔরসে জন্ম হ'ল না !

খাদ্যে ভেজাল দিলে যন্ত্রে ধরা যায়। দোষীর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কারণ ভেজাল খাদ্যে মানুষ পঙ্গু হয়। আর আশ্চর্যের বিষয় ঈশ্বর, ধর্ম, বিজ্ঞান - কে মিশিয়ে এক শ্রেণীর মানুষের বই সমাজকে বিষিয়ে দিয়ে বেষ্ট সেলার হয় - এই সমাজেই ! কারণ আমরা 'ধারণা'-র ক্রীতদাস। আমরা মাথা নোয়াতে খুব ভালবাসি।

এইসব মেরুদন্ডহীন মানুষদের অমেরুদন্ডীও বলা যাবে না। তার কারণ অমেরুদন্ডীরা ভগবানে বিশ্বাস করে না !

জন্মান্তরের গল্প ফেঁদে মানুষকে বোকা বানিয়ে গুরুদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ততদিনই থাকবে যতদিন আমরা অলীক ‘পাপের ভয়ে’ কাঁপব।

একবার এক স্বনামধন্য আশ্রমের ‘উচ্চপদস্থ’ মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলাম তিন বছরের যে শিশু ক্যান্সারে মারা গেল সে কী পাপ করেছিল ? তিনি আমায় উত্তর দিয়েছিলেন গত জন্মের পাপে তার মৃত্যু হয়েছে। বুঝলাম অন্যের শেখানো বুলি আওড়ানোর জন্য ওনার ‘পদোন্নতি’ কেউ রুখতে পারবে না।

পাপ-পুণ্যের ভয় দেখিয়ে সমাজের কিছু অন্যায়কে হয়ত রোখা যায় কিন্তু এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ ‘আধ্যাত্মিকতা’ ব্যাপারটাই ‘সোনার পাথরবাটি’।

দার্শনিক ইউজী-কে কোন শ্রেণীতেই ফেলা যাবে না।

কল্পনার জগৎকে সরিয়ে নিজের মেরুদন্ডে সোজা হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই বেঁচেছিলেন উপ্পালুরী গোপাল কৃষ্ণমূর্তি।

তাপস চক্রবর্তী